নবম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথ

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের 'হিন্দুমেলায়', রবীন্দ্রনাথ — তখন চোদ্দ বছরের বালক — 'হিন্দুমেলার উপহার' নামে যে কবিতাটি পাঠ করেন সেটিই তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা,[1] জাতীয়মেলার ভাবানুসারী স্বদেশবন্দনা, এই স্বদেশচেতনা, তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডলে, সমগ্র উনিশ শতকী ধরে, নির্মিত হয়েছিল। এদেশের সমাজচেতনার ও স্বদেশবোধের প্রথম উদ্গাতা, রামমোহনের সঙ্গে, দ্বারকানাথের সৌহার্দ্য, ও রামমোহনের প্রায় সকল কর্মে তাঁর সমর্থন,[2] ঠাকুর পরিবারকে প্রথমাবধি-ই যুগ পরিবর্তনের ঐতিহাসিক শক্তির সঙ্গে যুক্ত রেখেছিল। রামমোহনের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[3] দ্বারকানাথের মৃত্যুর পূর্বেই, তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঠাকুর পরিবারে, স্বদেশ ও জাতীয় চেতনার যে প্রতিবেশ রচিত ও লালিত হয়েছিল, দেবেন্দ্রনাথের অভিভাবকত্বে, তা-ই জাতীয় ও স্বদেশ চেতনার উদ্ভাবনা ও বিকাশের ফলে, হিন্দু বা জাতীয়মেলা ও অন্যান্য স্বদেশ বিষয়ক কর্মের পারিবারিক গণ্ডী থেকে, দেশের বৃহত্তর প্রান্তরে প্রসারিত হয়ে যায়।

পারিবারিক পরিমণ্ডলে লালিত এই স্বদেশ ও জাতীয় চেতনাই, রবীন্দ্রনাথের চরিত্র গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান। শেষ কৈশোর থেকে প্রায় মধ্য পঞ্চাশ পর্যন্ত, তাঁর স্বদেশ ও সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে এই পারিবারিক আবেষ্টনী থেকে আহৃত, বোধ ও চেতনা, ঐক্যবোধ ও আন্তর্জাতিক চেতনায় ক্রমপরিণতি লাভ করেছে। রামমোহনের ঐক্যবোধ তাঁর সমাজ চিন্তার অনুবর্তী মানবের সার্বিক স্বাধীনতার উপাসক, তিনি, স্ব সমাজের সংস্কার, মুক্তি ও আধুনিকতার প্রচেষ্টার সঙ্গেই, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের মানবগোষ্ঠীর অধীনতা মুক্তির প্রয়াসকে, অকৃত্রিম সমর্থন জানান। এই ঐক্যবোধ ও আন্তর্জাতিকতা এদেশীয় সমাজচিন্তায় প্রথমাবধি-ই উপস্থিত থাকলেও, রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এই বোধ ও চেতনা কোন স্পষ্ট অবয়ব পায়নি। সিপাহী যুদ্ধ-পূর্ব, সমাজ ও শিক্ষা আন্দোলনের চরিত্রের সঙ্গে, সিপাহী যুদ্ধোত্তর সমাজ শিক্ষা আন্দোলনের মূলগত পার্থক্য বর্তমান। তৎকালীন সমাজ ইতিহাসে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী উদ্যোগের সংস্কার আন্দোলন উনিশ শতকীয় দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পরিণতি লাভ করেছে। স্বাধীনতা স্বাবলম্বন, ইংরেজ শাসনকে স্বীকার করে নিয়েই স্বায়ত্ত শাসনের স্বপ্নময় অভীপ্সা,

জন প্রাধান্য পেয়েছে, আর হিন্দু পুনরুজ্জীবনের প্রভাবে, এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নিয়েছে। এই জাতীয়তা বোধের প্রাথমিক উন্মেষে হিন্দুবোধ ও জাতীয়তাভিত্তিক চেতনার রামমোহন সৃষ্ট ধারাটি, খণ্ডিত হয়ে যায়, দেবেন্দ্রনাথ সৃষ্ট ব্রাহ্ম ধর্মের আন্দোলনও দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে, দেবেন্দ্রনাথের সমাজ সংস্কার বিরোধী মনোভাবের জন্য, ব্রাহ্ম সমাজের যে অংশ, নববিধান ব্রাহ্ম সমাজে মিলিত হয়েছিল, কেশবসেনের মধ্যে গুরুবাদ প্রকাশে সেই শাখার এক বড় অংশ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে মিলিত হলেন। সংঘই হল, এ সমাজের নিয়ন্ত্রক। কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এ সমাজ পরিচালিত হত না। এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল যুক্তিবাদ ও নিয়মতান্ত্রিকতার উপর। এই সমাজের অন্যতম নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রকাশিত "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা' ফরাসী বিপ্লবের এই বাণী উদ্ধৃত থাকত।[৪]

যে ব্রাহ্ম সমাজ, উনবিংশ শতাব্দীর নতুন চেতনায় প্রবীন শক্তি ছিলেন, এদেশের সমাজ বিকাশের ইতিহাসে চিহ্নিত, সেই ব্রাহ্মসমাজ-ও সমাজ প্রশ্নে, গুরুবাদের প্রশ্নে, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ব্রাহ্ম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়, সমকালীন সমাজ-ধর্ম নৈতিক পরিবেশের তাড়নায়। এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ এই কালেই, আপন ধর্মবোধকে, মুক্ত ও হিন্দু বোধের সর্বজনীনতা ও জাতীয়তাভিত্তিকতায় উত্তরণের প্রাথমিক ভিত্তি নির্মাণ করতে থাকেন। হিন্দু পুনর্জাগরণের জোয়ারের, চন্দ্রনাথ বসু, শশধর তর্ক চূড়ামণি, রামকৃষ্ণ পরমহংস" এর প্রচারে ও প্রভাবে, যখন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে, ব্রাহ্ম ধর্মমত বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়েছে, তখন –

"এই মতকে প্রতিরোধ করিবার জন্য গত বৎসর হইতে ব্রাহ্ম সমাজের তিনটি শাখা সাম্বৎসরিক পর্বে মিলিত হইতেছে। এই বৎসরের (১২৯২ মাঘ ৯) অনুষ্ঠানে আদি ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ হইতে, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ নববিধান সমাজ হইতে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ত্রৈলোক্য নাথ সান্ন্যাল এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ হইতে শিবনাথ শাস্ত্রী ও উমেশ চন্দ্র দত্ত বেদি গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে আমরা রবীন্দ্রনাথকে বেদিতে ব বসিতে দেখি নাই।"[৫] ব্রাহ্ম সমাজকে, ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে নিয়ে যেতে-ও এই কালে তিনি উৎসাহী। ১২৯৪ বঙ্গাব্দে, তিনি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এক বিজ্ঞাপনে জানান, যে, যাঁরা আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ, তাঁদের নিয়ে তিনি 'ব্রাহ্মণসমিতি' স্থাপন করতে চান।[৬]

তাহা বাংলাভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। জ্যোতিদাদাও তরুণ বয়স হইতে অবিশ্রাম বঙ্গভাষায় পুষ্টিসাধন করিয়া আসিতেছেন। আমাদের পরিবারে শিশুদেরও ইংরাজী পত্র লেখা একেবারে নিষিদ্ধ। শুনিয়াছি নূতন আত্মীয়তাপাশে বদ্ধ হয়ে তাঁহাকে একবার ইংরাজীপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ফেরৎ আসিয়াছিল। আমরা আপনা আপনির মধ্যে কেহ কাহাকে এবং পারতপক্ষে কোন বাঙালীকে ইংরাজী ভাষায় পত্র লিখি না — আমাদের এই আচরণটিকে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিলাম, আশা করি, একদা অদূর ভবিষ্যতে তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিস্ময়াবহ বলিয়াই গণ্য হইবে।

আমাদের পিতামহ ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে বেলগাছির বাগানে নিমন্ত্রণ করিয়া সর্বদা ভোজ দিতেন, একথা সকলেই জানেন — কিন্তু শুনিয়াছি তিনি পিতাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন যে, ইংরাজকে যেন খানা দেওয়া না হয়। তাহার পর হইতে ইংরাজদের সহিত সম্বন্ধ আর আমাদের নাই, এবং পিতামহের আমল হইতে আজ পর্যন্ত সরকারের নিকট হইতে খেতাব লোলুপতার উদাহরণ আমাদের দেখা দেয় নাই।

স্বদেশানুরাগ প্রচারের উদ্দেশ্যে আমাদের বাড়ি হইতে 'হিন্দুমেলা' নামে একটি মেলার সৃষ্টি হইয়াছিল। ..... বড়দাদা ও আমার খুড়তুত ভাই গণেন্দ্র দাদা ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন — তাঁহারা নবগোপাল মিত্রকে এই মেলার কর্মকর্তা রূপে নিযুক্ত করিয়া ইহার কার্যভার বহন করিতেন।”[7]

সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে সমাজ জিজ্ঞাসার সঙ্গে সংঘাতে, মধ্যবিত্তর অভ্যুদয়ে, সমাজ সংস্কারের, কখনও একক এবং কখনও গোষ্ঠীবদ্ধ প্রয়াসে, ধর্ম সংস্কারের চেষ্টায়, বাঙলা দেশের সমাজ ইতিহাসের নতুন প্রেক্ষাপটের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির পরিবারের সংযোগ ছিল নিবিড়। কোম্পানির শাসনের প্রাথমিক যুগে এদেশীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সম্মুখে — দেওয়ানী কার্যের দ্বারা ধন উপার্জনের যে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল, দ্বারকানাথ তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিবদ্ধ হওয়ার এক বৎসর পরে তাঁর জন্ম (১৭৯৪), তিনি পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলেন, প্রায় জমিদারির —

রুশাঁকেকসনের দ্বারা নিজের সহজাত বিষয়বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করে তুলে,১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণার কালেক্টর ও সল্ট এজেন্ট প্লাউডেনের দেওয়ান " পদ গ্রহণ করেন, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দেই তখনকার বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ম্যাকিন্টশ কোম্পানির অংশীদার হন ও সেই সূত্রে 'কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক'র অন্যতম পরিচালক ও হন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'কাস্টমস' সল্ট এ্যাণ্ড অপিয়াম বোর্ডের দেওয়ান নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরই 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, কাস্টমস সল্ট এ্যাণ্ড অপিয়াম বোর্ডের দেওয়ানীর পদ ত্যাগ করেন ও 'কার ঠাকুর এ্যাণ্ড কোম্পানীর' স্থাপনা করেন। দুই বৎসর পরে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রাণীগঞ্জে কয়লাখনি কেনেন, "রাণীগঞ্জের কয়লার খাদ।" আলেকজাণ্ডার কোম্পানীর সেটি সম্পর্কীয় রাণীগঞ্জের কয়লার খাদ গত মঙ্গলবারে নীলাম হওয়াতে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ৭০০০০ টাকাতে তাহা ক্রয় করিয়াছেন।"[৮] দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার পূর্বে 'বেঙ্গল কোল কোম্পানী' স্থাপন করলেন। "ইংরাজ বণিকেরা এদেশের সমস্ত ব্যবসায় গুলি একে একে হাত করিয়া লইতেছে আর দেশী লোকগুলাকে মজুরের মতো খাটাইতেছে, ইহা তাঁহার কাছে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে হইত। তিনি কার ঠাকুর কোম্পানী নামে এক কোম্পানী খুলিলেন। কয়েকজন অংশীদারের সঙ্গে মিলিয়া 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নামে এক ব্যাঙ্ক ও প্রতিষ্ঠা করিলেন। শিলাইদাতে নীলকুঠি, কুমার-খালিতে রেশমের কুঠি, রাণিগঞ্জের সমস্ত কয়লার খনি, এবং রামনগরে চিনির কারখানা কিনিয়া এবং যোগ্যতার সহিত চালাইয়া দ্বারকানাথ অল্পসময়ের মধ্যে প্রচুর অর্থ করিলেন। তখন ক্র ক্র করিয়া রাজসাহীতে, পাবনায়, রংপুরে, যশোহরে জমিদারি কিনিয়া তিনি বাংলাদেশের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার হইয়া বসিলেন।"[৯] দেবেন্দ্রনাথের বর্ণনায় "আমার পিতা ১৭৬০ শকের পৌষমাসে যুরোপে প্রথমবার যান। তখন তাঁহার হাতে হুগলী পাবনা রাজসাহী কটক মেদিনীপুর রংপুর প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী, এবং নীলের কুঠী, সোরা চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আবার রাণিগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে, তখন আমাদের সম্পদের মধ্যাহ্ন সময়।"[১০]

ব্যবসায়ে অর্জিত দ্বারকানাথের এই সম্পদ, শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত না হয়ে,কোম্পানীর আইন অনুসারে, প্রধানতঃ জমিদারীতে নিয়োজিত হয়েছে। শক্তির অনিবার্য তাড়নায়, নব নব শিল্পকর্মে অনিয়োজিত বহু সম্পদ, কি যুক্তির তাড়নাতেই দ্বারকানাথের, ত্রিশবছরের ভোগবিলাসসূত্রে ব্যয়িত হয়ে যায়। মৃত্যুকালে তিনি এককোটি টাকা দেনা রেখে গেলেন। দেবেন্দ্রনাথ মাতাদের সহায়তায় সেই ঋণ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন ও পরিবারকে আবার –

সম্পন্নাশী করে তুলেছিলেন। দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথ এদেশের রাজনৈতিক সংগঠনের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি, ইয়ং বেঙ্গলদের নেতৃত্বে স্থাপিত বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল। এই সব সংস্থাতেই এদেশের রাজনৈতিক সংগঠনের প্রাথমিক ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল।

দ্বারকানাথ – দেবেন্দ্রনাথ দুটি এই প্রাচীন ও নবীন চেতনাই তো রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের মৌল আধার। এই পরিবারের মধ্যেই উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তনের মূল সূত্রগুলি গাঁথিত হয়েছে। রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ, এই বিবর্তনের সকল সূত্রগুলিই ঠাকুর পরিবারের বিবর্তনের সঙ্গে জড়িত। শাসকশ্রেণীর অর্থনৈতিক চরিত্রের বিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় এদেশীয় সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের বিবর্তনের সঙ্গেই যেন-বা, রবীন্দ্রনাথের পরিবারের পতন উত্থান ও জড়িত। সেই পরিবারের ইতিহাসে যেন সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর ও দেশীয় সমাজচিন্তার ও মনন চর্চার বিবর্তন ও সংঘাত, যাতে এই পরিবারের কতগুলি ঐতিহাসিক দায় ও বর্তে যায়। সেই দায় বহনের জন্যই যেন আত্মীয় সভা, ব্রাহ্মসভা, তত্ত্ববোধিনী সভার বিবর্তিত হয়। সেই দায়বদ্ধতার কারণেই যেন, রবীন্দ্রনাথকে রামমোহনের বিশ্বজনীনতা ও আন্তর্জাতিক বোধকে কালোপযোগী করে তুলতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বিলাত থেকে ফিরে আসেন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। এই মধ্যবর্তী দশ বৎসরে, এদেশের রাজনৈতিক চি ও আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত হয়ে পড়েছেন। প্রথমবারের বিলাতের অভিজ্ঞতাতে – রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ ইংরেজ সম্পর্কে মোহমুক্ত হতে থাকেন। তাঁর সমকালের এদেশীয় রাজনী ও ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যেন সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হতে পারছেন না। পারিবারি আধ্যাত্মসাধনার সূত্রে ভারতীয় দর্শনের প্রভাব ও আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞা প্রভাব, তাঁর চরিত্রের উপর প্রায় সমভাবে ক্রিয়াশীল।"

"প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার বৈদিক পুনরুত্থানের প্রয়াস, অপরদিকে আধুনিক পাশ্চা ও বিশ্বমানবতা বাদ – একদিকে আধ্যাত্মিকতা, অপর দিকে আধুনিক রাজনীতি সমাজবিজ্ঞান, – একথায় তাঁহার প্রাচীন চিন্তাধারার সহিত আধুনিক চিন্তাধা বিরোধটি তাঁহার চিন্তায় ও সাধনায় অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।" ১১

দর্শন, সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা যে ইংরাজী সভ্যতার সঙ্গে তিনি পরিচিত,

এদেশে, উপনিবেশে, ব্রিটিশের যে রূপ তিনি দেখতে পান না। বঙ্গবাসীর স্বাধীনতা-হীন মানসে তিনি পীড়িত হন, এদেশীয়দের ও ইংরেজদের, 'ভারতী'র যুগের গদ্য-রচনায় তীব্র বিদ্রূপ বিদ্ধ করেন। "বিখ্যাত ইংরাজ কবি বলিয়াছেন যে, আমরা বোকা জানোয়ারের মাংস খাই, যেমন ছাগল, ভেড়া, গরু। অধিক উদাহরণের আবশ্যক নাই — মুসলমানেরা আমাদের খাইয়াছেন, ইংরাজেরা আমাদের খাইতেছেন, যদি প্রমাণ হইল যে আমরা বোকা জানোয়ারের মাংস খাইয়া থাকি, তবে দেখা যাক — বোকা জানোয়ারেরা কি খায়। তাহারা উদ্ভিজ্জ খায়। অতএব উদ্ভিজ্জ যাহারা খায় তাহারা বোকা। এমন দ্রব্য খাইবার আবশ্যক? নির্বোধদের আমরা গাধা, গরু, ভেড়া বলি, খর্ব করিয়া থাকি। কখনো বিড়াল, কুকুর, শিয়াল বা ব্যাঘ্রবর্গ বলি না। ..... উদ্ভিজ্জ খোরাকী ভারতবর্ষকে ইংরাজ ব্যাঘ্রেরা নিত্য হজম করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু আফগানস্থানের প্রতি অর্ধক্ষুধায় থাকাতে মাংসাশী কাবুলবাসীদের গ্রাস করিলেন, তাহা হজম হইল না, পেটের মধ্যে বিষম গোলযোগ বাধাইয়া দিল। মাংসাশী জুলুদি ও ট্রান্সভাল পেটে সুস্থই রহিল না, আবার বমি করিতে চেষ্টা করিতে গিয়া আজের হইতে কদাচিৎ হইল, রোগ হইবার উপক্রম হইল। অতএব মাংসাশী প্রাণীর লোভ এড়াইতে যদি ইচ্ছা থাকে, তবে মাংসাশী হওয়া আবশ্যক। নহিলে আমরা বিসর্জন দিয়া পরের দেহের পুষ্টি নির্মাণ করাই আমাদের চরম সিদ্ধি হইবে।" [১২] ১২৮৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার 'ভারতী'তে, অস্বাক্ষরিত 'চুপ ব্যবস্থা' প্রবন্ধেও তিনি তীব্র ব্যঙ্গে ও বিদ্রূপে ইংরেজকে বিদ্ধ করলেন। অস্বাক্ষরিত হলেও এটি রবীন্দ্রনাথের রচনা বলেই স্বীকৃত হয়েছে। ইণ্ডিয়ান মিরর কাগজে, ইংলিশম্যানের কাগজের একটি উক্তি-ই এ প্রবন্ধের উৎস। "প্রবলে লাথি মারিয়া তারপর বাঙালীদের সঙ্গে কথা বলা উচিত" — এই উক্তিটি পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়া 'চুপ ব্যবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক লিখিলেন, "গবর্নমেন্ট একটি নিয়ম জারী করিয়াছেন যে 'অনেককে বাঙালীদের শরীর অত্যন্ত বেস্পুট হইয়া গিয়াছে, গবর্ণমেন্টের অধীনে যে যে বাঙালী কর্মচারী আছে, তাহাদের প্রত্যহ কার্যারম্ভের পূর্বে ঝুলাইয়া লওয়া হইবে।" সম্পাদক পাদটীকায় লিখিলেন, "যে সমগ্র জাতিকে কোনো বিজাতীয় কাগজ রাষ্ট্রের মধ্যে এরূপ কথা বলিতে সাহস করে, সে জাতি আমার প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়িয়া বিস্মিত হইবে না। ..... আর অন্য কোন দেশে যদি কোন কাগজ এরূপ জনসাধারণের আত্মসম্মানে আঘাত দিত, তাহা হইলে দেশবাসীরা নানা উপায়ে তাহার অপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করিত। কিন্তু এতদিন ইহাতে আমরা লাথি হজম করিয়া আসিতেছি যে আর উহা আমাদের গুরুপাক

বলিয়া ঠেকিতেছে না।" সমগ্র প্রবন্ধটি স্বাক্ষর, রচয়িতার নাম না থাকিলেও উহা যে রবীন্দ্রনাথের লেখনী প্রসূত — সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।" [১৩]

সমকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের ও উত্তেজনার কোনো প্রভাব যেন রবীন্দ্রনাথে অনুপস্থিত। উপরন্তু তিনি তৎকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য-র সঙ্গে একমত হতে পারছিলেন না। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের স্বল্পসংখ্যকই এ আন্দোলনের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল থাকত, এবং এর হাত থেকে সর্ব সাধারণের দুঃখ দুর্দশা, বাইরে থাকায় যেন, রবীন্দ্রনাথ এ আন্দোলনের যথার্থ নির্ভর অপারগ হয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে তীব্র আক্রমণ করেন। এই আন্দোলনের মুখ্য পদ্ধতি ছিল, সভা সমিতির মাধ্যমে, বক্তৃতার দ্বারা, তাও ইংরাজী ভাষায়, নিজেদের দুঃখ দুর্দশার কথা, ইংরেজ শাসকদের কাছে তুলে ধরা। এই পদ্ধতি ও অবলম্বিত ভাষাই হল, সাধারণ মানুষকে, এর বাইরে রেখে দেয় —

> "সোডাওয়াটার বোতলে রাখিবার গ্যাসের মত যতক্ষণ গুরুভারে ছিপির মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইতে থাকে, ততক্ষণ তাহা কিছুর কাজে লাগে — কিন্তু যখন ছিপি ছুটিয়া ছাড়া পায় ও বাহির হইতে থাকে তখন সেটা ছাড়া হইতে হয়। …. এখন 'আজাদী' 'উন্নতি' 'স্বাধীনতা' নামক কতগুলা শব্দ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা অনবরত হাওয়া খাইয়া খাইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে ও তারাবাজির মত উত্তরোত্তর আসমানের দিকেই উড়িতেছে, অনেক দূর আকাশে উঠিয়া হঠাৎ আলো নিবিয়া যায় ও ধপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। আমার মতে আকাশে এরূপ দুমো তারাবাজি উড়াইলেও বিশেষ কোনো সুবিধা হয় না, আর ঘরের কোণে পিট পিট করিয়া একটি মাটির প্রদীপ জ্বালিলেও অনেক কাজে লাগে।" [১৪]

এই রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধ সমালোচনায় তিনি একটি কর্মপন্থাও নির্দেশ করেন —

> " আগে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদাহরণ সংগ্রহ কর, ভাবিতে আরম্ভ কর ও বলিতে শেখ, তাহা হইলে আর সকল বুঝিতে আরম্ভ করিবে। রেগে করিয়া বলিলে কিছুই হয় না, ভালো করিয়া বলিলে কি না হয়। আতিশয্যের দিকে যাইও না, কারণ যেখানেই বুদ্ধি হীন আতিশয্যপ্রিয় প্রথা, সেই খানেই স্বেচ্ছাচারী প্রভুত্ব শাসন প্রাপ্তি।" [১৫]

তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনকে বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ, সমালোচনায় বিদ্ধ করলেও রবীন্দ্রমনের মূলোচ্ছেদিতা স্পষ্টতঃ একটি অবয়ব পাচ্ছিল। অনুমান করা যায়, প্রচলিত আন্দোলনে দেশের

সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণের অভাব এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দিচ্ছিল, তা অনুভব করে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে জাগরিত ইংরেজদের সর্বাত্মক আক্রমণের সামনে রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনকে জাতির দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

> " ......আমাদের পোলিটিক্যাল অ্যাজিটেশন করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা। ......ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই — ক্রমশই তাহাকে হীন হইতে হয়। ...... ইংরাজের কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভর পাইতে পারি না। আর, তাহাই যদি না পাই তবে আসল জিনিসটাই পাইলাম না। বাস্তবিক, ভিক্ষার ধন অস্থায়ী, আত্মনির্ভরের ধন স্থায়ী। আমাদের সমস্ত জাতির যদি এই একমাত্র কাজ হয়, ইংরাজদের কাছে আবদার করা, ইংরাজদের কাছে ভিক্ষা করা, তাহা হইলে ক্রমশ আমাদের — জাতির জাতিত্ব নষ্ট হইতে থাকিবে — ক্রমশই আমাদের আত্ম বিসর্জন দিতে হইবে। ....
>
> ..... যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করিলে আমাদের দেশে এমন ঢের কাজ আছে যাহা আমরা নিজেরাই করিতে পারি, এবং যাহা কিছু আমরা নিজে করিব তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও তাহার কিছু না কিছু ফল স্থায়ী হইয়া থাকিবে। .... দেশের লোককে তাঁহারা কেবলই রণে উদ্দীপনার বাক্যশিক্ষা দান, বাল্মীকি ও ভীষ্মার্জুনের দোহাই দিয়া গবর্মেন্টের কাছে ভিক্ষা চাহিতে — বলিতেছেন। তাহার চেয়ে সেই উদ্দীপনাশক্তি ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে উপার্জন করিতে বলুন না কেন। ...... সত্য বটে পরাধীন জাতি নিজের সমস্ত হিত নিজে সাধন করিতে পারে না, কিন্তু যতখানি পারে ততখানি সাধন করাই তাহার প্রথম কর্তব্য, গবর্মেন্টের কাছে ভিক্ষা চাওয়া বা গবর্মেন্টকে পরামর্শ দিতে যাওয়া পরে হইতে পারে বা তাহার আনুষঙ্গিক — রূপে হইতে পারে। .....
>
> ......যাঁহারা যথার্থ দেশ হিতৈষী তাঁহারা দেশের ক্ষুদ্র উপকারকে নিজের অযোগ্য বলিয়া ঘৃণা করেন না।[১৬]

এই জাতীয় উত্থানের কর্মে তিনি জাতীয় ভাষায় শিক্ষাকেই গুরুত্ব দিলেন। "বঙ্গ বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরেজীতে শিক্ষা কখনই দেশের মর্মে ছড়াইতে পারিবে না।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের হাতে প্রায় নিত্য এদেশবাসীর ব্যক্তিগত লাঞ্ছনা ও

অপমানের প্রতিরোধের দ্বারা একটি চেতনার উদ্বোধন করতে চেয়েছেন। —

" আজকাল প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়াই ইংরেজ কর্তৃক দেশীয়দের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী একটা না একটা শুনিতেই হয়। .... যতবার মফস্বলে একজন ইংরেজ একজন দেশীয়ের প্রতি অত্যাচার করে, যতবার সেই দেশীয়ের পরাভব হয়, যতবার সে অদৃষ্টের মুখ চাহিয়া সেই অত্যাচার পরাভব নীরবে সহ্য করিয়া যায়, যতবার সে নিজেকে সর্বতোভাবে অসহায় বলিয়া অনুভব করে, ততবারই যে আমাদের দেশ দাসত্বের গহ্বরে এক পা এক পা করিয়া আরও নামিতে থাকে। কেবল কতকগুলা মুখের কথায় তুমি তাহাকে আত্মমর্যাদা শিক্ষা দিবে কি করিয়া। .....শিক্ষা দিতে চাও তো এক কাজ কর, একবার একজন ইংরেজের হাত হইতে একজন দেশীয়কে ত্রাণ কর, একবার সে বুঝিতে পারুক ইংরেজ ও অদৃষ্ট একই ব্যক্তি নহে। .....ইংরাজের প্রতিদিনকার ব্যবহারগত যথেচ্ছাচারিতা দমন করিয়া যখন দেশের লোকেরা আপনাদিগকে তাহাদের সমকক্ষ জ্ঞান করিবে, তখনই আমাদের যথার্থ উন্নতি আরম্ভ হইবে, ... সে কখন হইবে, যখন আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরাও ইংরাজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া কথঞ্চিত আত্মরক্ষার প্রত্যাশা করিতে পারিবে। সে শুভদিনই বা কখন আসিবে? যখন স্বদেশের লোক স্বদেশের লোকের সাহায্য করিবে। এ যে শিক্ষা এই যথার্থ শিক্ষা, এ কুস্তির ব্যায়াম শিক্ষা নহে, ইহাই স্বদেশ হিতৈষিতার প্রকৃত চর্চা "।[১৮]

ইতিমধ্যে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে, একটি যুগান্তকারী ঘটনা, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা, হয়ে গেছে। কলিকাতায় দ্বিতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসে গান গেয়েছেন। কংগ্রেস, এদেশের প্রাদেশিক ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটি জাতীয় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে পরিণত করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায়, এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের গোটা অবয়বটি-ই পাল্টে যেতে শুরু করল। রবীন্দ্রনাথ, কংগ্রেসের আবেদন নিবেদন পদ্ধতিকে সন্দেহের চোখে দেখলেও ও তার তীব্র সমালোচনা করলেও, কংগ্রেসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের হোমরুলের প্রশ্নে গ্ল্যাডস্টোনের পরাজয়ে, ইংলণ্ডের রাজনীতিতে যে পরিবর্তন ঘটল, তাতে প্রধান মন্ত্রী হলেন লর্ড সলসবেরী ও ভারত সচিব হলেন লর্ড ক্রস। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের

তদন্তের প্রতিবেদন ও এ বিষয়ে সরকারের মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। চার্লস ব্রাডল-ও প্রায় এক বৎসরের অনুসন্ধানের পর, ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনের অনুকূলে, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস বিল, কমন্স সভায় পেশ করলেন। এই বিলকে কেন্দ্র করে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হল। প্রতিক্রিয়াশীল সদস্যরা হিন্দু মুসলমানের কাল্পনিক বিরোধের ধুয়া তুললেন। এই সময়-ই লর্ড ক্রস, লর্ডস সভায়, তাঁর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস বিল পেশ করলেন। এই বিলে বর্ধিত ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের বাজেট বিতর্কে অংশ গ্রহণের ও প্রশ্নোত্তরের অধিকার দেওয়া হলেও, সদস্য নির্বাচনের বিষয়টিকে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বাতিল করা হোল। প্রধান মন্ত্রী — ভারতসচিব ও তাঁর অনুগামীদের প্রধান যুক্তি ছিল নির্বাচন প্রাচ্য ঐতিহ্যে অনুপস্থিত, সেই কারণে ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। কমন্স সভায় উত্থাপিত হলে, উদারনৈতিক দল এর তীব্র সমালোচনা করলেন। এদেশে কংগ্রেস ও নির্বাচনের পক্ষে এবিলের সমালোচনা করল।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচনের এই প্রশ্নই 'অক্ষম অভিযোগের পশ্চাৎপট। 'অক্ষম অভিযোগ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ, এদেশে, ইংরেজ শাসনের ইত্যর্থক দিকগুলোর উল্লেখ করেছেন, এবং স্বীকৃতি দিয়েছেন। এদেশের রাজনৈতিক চেতনা ও ইংরেজেরই দান।

"......ইংরাজ গবর্নমেন্টের নিকট হইতে আমরা এত বড়ো সুখ লাভ করিয়াছি যে তাহার নিঃস্বার্থ উদারিতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কৃতঘ্নতা মাত্র।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসকেও ইংরাজেরই এক অংশের দ্বারা ব্রিটিশ সভ্যতার যথার্থ বাহক — দান বলে বর্ণনা করেছেন, ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাকেই ইংরাজ জাতির মহত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করেছেন।

"ইংরাজের মহিমা কংগ্রেসের অস্থিমজ্জার মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতেছে, ইংরাজেরই মহৎ উজ্জ্বল অপূর্ব নিঃস্বার্থ প্রীতি জনহৃদয়ের মর্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া তাহাকে অলৌকিক বলে বলীয়ান করিতেছে। বাহিরের আমলাশিয়ের তুচ্ছ রাজকর্মচারীদের প্রকাশ ও গোপন কার্যপ্রণালীর মধ্যে ইংরাজের যে অনুদারতার পরিচয় পাইতেছি — একদিকে দুর্ভাগা দরিদ্রজাতির জন্য ব্রিটনের সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন, ইষ্ট ও ভস্ত্র বর্ণের জ্যোতির্ময় সমগ্রতা আমাদের অত্যন্ত নিকটে থাকিয়া আমাদের অন্তরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেছে।"[২০]

রবীন্দ্রনাথ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচনের বিষয়টি ইংরাজ রাজপুরুষের ইচ্ছাধীন রাখতে চাননা বলেন ,

> "গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নির্বাচনের অর্থ আর কিছুই নয়, একটি বা দুইটি বা অল্প সংখ্যক ইংরাজের দ্বারা নির্বাচন।" [21] কিন্তু দেশের -

> " ভারত শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতবর্ষেরই উন্নতি। আমাদেরই সুবিধা আমাদেরই লাভ। সেই আমাদের লাভের জন্য আমাদের লোকের সাহায্য প্রার্থনীয় হইয়াছে। সকলেই মনে হয় আমরা বাছিয়া দিলে কাজটাও ভাল হইবে, আমাদের মনেরও সন্তোষ হইবে।" [22]

রবীন্দ্রনাথ, এদেশীয়দের দ্বারাই এই মন্ত্রিনির্বাচনের কংগ্রেস-র দাবি সমর্থক।

> " কংগ্রেসের নিকট হইতে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইতেছে, তাহার প্রতি এমন ভ্রূকুটি করিয়া থাকা তোমাদের বিবেচনায় ভুল। তাহার প্রতি প্রসন্ন কর্ণপাত করা রাজনৈতিক ধর্মনৈতিক সকল প্রকার কারণে তোমাদের কর্তব্য। কারণ, কনগ্রেস দেশও কিছু ব্যক্তির মধ্যে সেতু বন্ধ করিয়া দিতেছে।
>
> গবর্নমেন্টের দ্বারা মন্ত্রী নিয়োগ অপেক্ষা, সাধারণ লোকের দ্বারা মন্ত্রি অভিষেক অনেক কারণে, আমাদের নিকট প্রার্থনীয় মনে হয়।" [23]

ভারতীয় যুগের রাজনৈতিক গদ্যরচনায় ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের একটি স্পষ্ট অবয়ব পাওয়া যাচ্ছিল। মন্ত্রি অভিষেক যেন সেই প্রবাহ-র বাইরের। রবীন্দ্র - মননে ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর সর্বত্র ক্ষমতার সর্বগ্রাসী আকাঙ্খার প্রাবল্য, ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হওয়ার যে - প্রতিক্রিয়া, এই যুগের গদ্য রচনায় প্রকাশিত, মন্ত্রি অভিষেকে যেন তা অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডের উদারনৈতিক রাজনীতিবিদদের উপর আস্থা স্থাপন করেছেন। মন্ত্রি অভিষেক রচনায় অব্যবহিত পরেই তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। কিন্তু বিলাতে এইবার তিনি বেশিদিন থাকতে পারলেন না, যে ইউরোপীয় সভ্যতার আত্মার অন্বেষণে তাঁর যাত্রা, সে আত্মার সন্ধান তিনি যেন পাচ্ছেন না। ইংলণ্ড আপনাকে যেন নতুন এক দুর্গে রক্ষিত করে রেখেছে, সেই বহিরঙ্গকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ তার অন্তরকে স্পর্শ করতে পারছেন না। তার মনে হয় ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উৎকেন্দ্রিকতা, ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদে উত্তীর্ণ হওয়ার সেই ক্রান্তিলগ্নে, মানুষকে ধন - ঐশ্বর্যের ভোগ সুখের পার্থিব কামনা - বাসনায় বদ্ধ করে ফেলায়, উপনিবেশ

সমকালীন পরিমণ্ডলের ইংলণ্ড, রবীন্দ্রনাথকে মানসিক আশ্রয় দিতে ব্যর্থ হয়। এই ভোগ সুখের প্রত্যক্ষে তিনি বলে চলেন –

"এদের কারবার এদের আমোদ প্রমোদের মধ্যে যখন ভালো করে চেয়ে দেখি তখন মানুষের কল্যাণ রূপ দেখা যায় না। এরাই রাজা বটে, এরা আজ সমৃদ্ধ হবার নয়, এদের সুবিধে করবার এবং এদের আমোদ দেবার জন্য মানুষের চরম শক্তি অবিশ্রাম খেটে মরছে। .... এই সুখ সমৃদ্ধি অন্তরালে কী অসহ্য দারিদ্র্য আপনার জীবন পাত করছে সেটা আমাদের চোখে পড়ে না, প্রকৃতির খাতায় উত্তরোত্তর তার হিসেব জমা হচ্ছে। প্রকৃতিতে উপেক্ষিত জেনে আপনার প্রতিশোধ নেবেই। ....যদি সভ্যতা আপনাকে রক্ষা করতে চায় তো প্রতিবেশীকে আপনার সমান করে তুলুক। দুটো শক্তি যত এক সঙ্গে সাম্য রক্ষা করে কাজ করে ততই মঙ্গল – যেমন আকর্ষণ, বিকর্ষণ, স্বার্থ এবং পরার্থ, আপনার উন্নতি ও চতুর্পার্শ্বের উন্নতি। নইলে চতুর্পার্শ্ব তার প্রতিশোধ তোলে, বর্বরতা সভ্যতাকে ধ্বংস করে। আমার তো সেই জন্য মনে হয় – আশ্চর্য নেই যে ভবিষ্যতে কাফ্রিরা য়ুরোপ জয় করবে, কৃষ্ণ অমাবস্যা দিনের আলোকে গ্রাস করবে, আফ্রিকা থেকে রাত্রি এসে য়ুরোপের শুভ্র দিনকে আচ্ছন্ন করবে। .....আলোকের মধ্যে ভয় নেই, কেননা তার উপরে সকলের চক্ষু পড়ে আছে – কিন্তু যেখানে অন্ধকার জমা হচ্ছে, বিপদ সেইখানেই গোপনে বল সঞ্চয় করছে, সেইখানেই প্রলয়ের গুপ্ত জন্মভূমি।" ২৪

রবীন্দ্রনাথ যেন সাম্রাজ্যবাদ ও আধুনিক সভ্যতার সমস্যা বিষয়ে সচেতন হয়েছে তাঁর তৃতীয় দফতে, এই সভ্যতার সাম্রাজ্যবাদে পরিণত ও ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ভবিষ্যত যে প্রতিভাসিত, সম্পদের ভারে পীড়িত এই সভ্যতা অন্তর্গত শক্তির তাড়নায়, অচিরেই অন্যকোন পথ অন্বেষণ করবে, এ সত্য যেন তিনি অনুভব করে চলেন। ইউরোপের সমাজের সঙ্গে স্বদেশের সমাজের এক ধরনের তুলনা ও এসে যায়। ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিবার ভিত্তি, ব্যক্তিকে সর্বদা একক করে রেখেছে, সেই একাকীত্বের দায় আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের ঐতিহ্যে অনুভূত হয় না।

"আমার তো মনে হয় আমাদের মেয়েরা ইংরেজ মেয়েদের চেয়ে ঢের বেশী সুখী। ...... নিজের ছেলেমেয়ে, নিজের স্বামী এবং বৃহৎ পরিবারের মধ্যে তাদের অন্তরের সমস্ত প্রবৃত্তি চরিতার্থতা লাভ করে — ভালোবাসার সমস্ত শাখা প্রশাখা চতুর্দিকে আপনাকে প্রসারিত করবার স্থান পায়। .... আমাদের বালবিধবারা প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ 'ওল্ড মেইড'-এর সমতুল্য (old maid) — কিন্তু বৃহৎ পরিবারের মধ্যে শিশুজনের শুশ্রূষা সহিত বিচিত্র প্রকারে তাদের নারীহৃদয়কে সর্বদা কোমল ও সরস করে রাখে, সভা কিম্বা কুকুর শাবকের দ্বারা সমস্ত শূন্য জীবনকে আবৃত রাখবার আবশ্যক হয় না। আমার মনে হয়, সভ্যতার আবর্তনে ইয়ুরোপীয় — মেয়েরা এতদূর বেরিয়ে এসেছে যে, তাদের কেন্দ্র থেকে ছিন্ন হয়ে বহুদূর বাহিরে গড়িয়ে পড়েছে। ......আমাদের ব্যক্তিগত জাতীয় উন্নতির পক্ষে যতই ব্যাঘাতজনক হোক, আমাদের বৃহৎ পরিবার মেয়েদের পক্ষে একান্ত উপযোগী। কারণ ভালোবাসাহীন শূন্য স্বাধীনতা নারীর পক্ষে অতি ভয়ানক, মরুভূমির স্বাধীনতা পথভ্রান্ত লোকের পক্ষে যেমন নিদারুণ শূন্য।" [২৫]

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বার বিলাত ভ্রমণের সমকালে ইউরোপীয় সভ্যতার আবহাওয়াতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। 'ডারউইনের Descent of Man ও ক্রপটকিনের Mutual Aid তত্ত্ব লইয়া উত্তেজনাপূর্ণ সমালোচনা চলিতেছে। ১৮৮৭ সালেই কার্ল মার্কসের Das Kapital ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। পরবৎসরই স্যামুয়েল মুর কর্তৃক 'Communist Manifesto'-র ইংরাজী তর্জমা প্রকাশিত হয়। ১৮৮৯ সালে এঙ্গেলসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা হয়। অপর দিকে সিডনি ওয়েব ও বার্নার্ড শ এই সময়ই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রচার করিতেছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বার্নার্ড শ-র Fabian Essays প্রকাশিত হয়।" [২৬] এই কালখণ্ডেই "দুই মাস এগারো দিন"-এর জন্য রবীন্দ্রনাথের বিলাত ভ্রমণ। ডারউইনের তত্ত্বের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে। দেশে প্রত্যাবর্তন কালে, ওয়ালেসের লেখা 'ডারউইনিজম' পাঠ করেছেন।[২৭] এবং এই প্রত্যাবর্তন কালেই, ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে প্রাচ্য সভ্যতার তুলনায় 'সোশ্যালিজম'-এর কথা ও এসে গেল।

"কিন্তু তোমরা খুব সভ্য জাতি, তোমরা অনেক মহৎ কার্য করেছ, অতএব তোমাদের সমস্ত প্রথাকেই মানবের উন্নতির অনুকূল বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু আমরাও এককালে উন্নত জাতি ছিলুম, এই বিপুল শ্রী পূর্ণ পরিবারের ভারে ভারাক্রান্ত

> হয়ে আমাদের পতন হয়েছে — এবং কে বলতে পারে ঐ উত্তরোত্তর বর্ধনশীল সুপারন্ত আরামের মধ্যেই তোমাদের সভ্যতার সমাধি হবে না ? ভারতবর্ষে পারিবারিক প্রথা ক্রমে এত বিপুল এবং জটিল হয়ে পড়েছিল যে সমাজের সমস্ত শক্তি পরিবার রক্ষার মধ্যেই পর্যবসিত হয়েছিল। সংহত পরিবারের চাপে ব্যক্তিগত মনুষ্যের স্ফূর্তি বদ্ধ হয়ে সমস্ত একাকার হয়ে এসেছিল। তোমাদের আরাম ক্রমেই এত বেড়ে উঠছে যে, স্বাধীন গতিবিধির পথ বদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। তোমাদের পরিবার প্রতিষ্ঠার শক্তি বদ্ধ হয়ে আসছে — পণ্ডিতেরা ভীতভাবে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, এবং Socialism মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর বিভীষিকার উপক্রম করছে।" ২৮

ইওরোপের পরিবর্তিত সমাজচিন্তা, সভ্যতার বিবর্তনের নতুন দিগন্ত, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে সভ্যতার উত্তরণের নতুন পথ নির্দেশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল অনুমান করা যায়। বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, তিনি সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক যে মতামত প্রকাশ করেন, তাতে, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ উল্লেখ না থাকলেও পাশ্চাত্যের নতুন সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে তিনি অবহিত ছিলেন অনুমান করা যায়। এই কালেই তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নারী স্বাধীনতা ও মর্যাদা বিষয়েও আলোচনা — করেছেন। এ দেশীয় সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, নতুন জীবনদৃষ্টি দ্বারা ,এতাবৎ কালের জীবনদৃষ্টিকে পরিবর্তিত করতে হবে।

> "কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হয়ে আসছে। এখন আমাদের বাইরে বিক্ষিপ্ত হবার সময়, কেবলমাত্র পরিবার প্রতিপালন আমাদের একমাত্র কাজ বলে ধরে নিলে চলে না। ইংরেজের সংঘর্ষে এসে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আমাদের একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। ..... শিক্ষা করতে এবং শিক্ষা দিতে হবে, আপনার শক্তি দেশে বিদেশে পরিচালিত করতে হবে। সুতরাং মেয়েদের অবস্থারও পরিবর্তন আবশ্যক। এখন কেবল তাদের ঘরের সঙ্গিনী করলে চলবে না। তাদেরও জাগ্রত হয়ে আমাদের জাগ্রত করতে হবে। তাদের মধ্যেও নবজীবনের উন্মেষ আবশ্যক।" ২৯

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিকে তাঁর কর্মক্ষেত্র ও প্রতিভার বাইরে রেখেছিলেন। সেই কারণেই, উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে, যখন রাজনীতির মত ও পথ নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচুর মতান্তর ও মনান্তর, তখন রবীন্দ্রনাথকে মধ্যস্থতা করতে

হয়েছে । 'ভারতী' যুগের রাজনৈতিক প্রবন্ধ যেমন, 'সাধনা', বঙ্গদর্শনের যুগেও তেমনই । সমকালীন রাজনীতি ও রাষ্ট্র শাসন বিষয়ই অধিক আলোচিত হয়েছে । তার মধ্যে তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত ও উপায় থাকলেও, রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিচিন্তার মৌলিক রূপটি তেমন ভাবে ধরা পড়েনি । আসলে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাজাত রাজনৈতিক বিরোধ, মানব সভ্যতার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে না তোলা অবধি । ইওরোপীয় সভ্যতা ও রাষ্ট্রচিন্তা বিষয়ে এদেশীয় বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা আসেনি । ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম চোদ্দ পনের বৎসর তাঁরা, মত সমালোচনা সত্ত্বেও, ইওরোপীয় সভ্যতার প্রতি আস্থা রেখেই যান । প্রচলিত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্ত যে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রতত্ত্ব ক্রমশ একটি আকার নিচ্ছিল, সে বিষয়েও এদেশের বুদ্ধিজীবীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সম্যক জ্ঞাত ছিলেন না, তবে পাশ্চাত্যের ক্রমবর্ধিত সাহচর্যে, সমাজতান্ত্রিক বিষয়ে অল্প প্রাথমিক জ্ঞান চর্চা আর শুরু হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই, সভ্যতা ও সমাজ রাষ্ট্র বিষয়ক রবীন্দ্র চিন্তায় পরিবর্তন সূচিত হয় । সাম্রাজ্যবাদের যে রূপ তিনি, ইওরোপে প্রত্যক্ষ করেছেন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার যে দুর্বলতা তাঁর স্বকীয় রূপে প্রতিভাসিত হয়েছিল, প্রথম মহাযুদ্ধে ফলে তাই একটি স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে । যদিও, সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সঙ্গে তার পরিচয়, সাধনায় প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত একটি চিঠিতে উপস্থিত ।

দ্বিতীয়বার বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই ১২৯৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের — (ইং ১৮৯১) 'সাধনা' পত্রিকায়, রবীন্দ্রনাথ ইওরোপে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রাবল্যের উল্লেখ করেছেন ।

> "য়ুরোপে কিছুদিন হইতে 'সোশ্যালিস্ট' নামক এক দলের উদ্ভব হইয়াছে । তাহারা সর্বসাধারণের মধ্যে ধন সমভাবে বিভাগ করিয়া দিতে চায় । এতকাল এই সোশ্যালিজম মত প্রায় নাস্তিকতার সহচর রূপে ছিল । প্রায় সমস্ত সোশ্যালিস্ট স্পষ্টই নাস্তিকতার ঢোঁড়াশি প্রচার করিয়া আসিতেছেন । সম্প্রতি একটি পরিবর্তন দেখা যাইতেছে । .... রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীর অধিপতি স্বয়ং পোপ লিও অল্পদিন হইল তীর্থযাত্রী একদল ফরাসী মজুরদের সম্বোধন করিয়া আপনার অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন । ইহা একটি লক্ষণ রূপে ধরা যাইতে পারে । রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় প্রায়ই প্রবল পক্ষকে আশ্রয় করিয়া বললাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

রোগের খোঁজাখুঁজি রুগ্নদের নাড়ী টিপিয়া বসিয়া থাকেন। সোস্যালিস্টদের মানব উন্নতি ও ব্যাপ্তি নিশ্চিত অনুমান না করিলে তাঁহারা যে এ সমস্যা ইহার প্রতি প্রকাশ্য প্রসন্নতা দেখাইতেন ইহা তেমন সম্ভবপর বোধ হয় না। তাঁহারা এমন বাতুলের পত্র কখনই চতুর্দিকে করিতেন না যাহা দুই দণ্ড বসিয়া থাইবে।"[৩০]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, ইংল্যাণ্ডের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ও সংগঠনের গতি প্রকৃতির অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ খ্রীষ্টান ধর্মের আড়ালে স্বার্থের চরিত্র ও উদঘাটন করেছেন। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'সোস্যালিজম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক চিন্তাকে বিশদ করলেন, উৎপাদন মাধ্যম ও উৎপাদিত পণ্যের সর্বজনীন নিয়ন্ত্রণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে,

"......সোস্যালিস্টরা চাহে, যে, এই পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ কোন বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে না থাকিয়া সাধারণ সমাজের হস্তে পড়ে। তাহারা বলে, ধন উৎপাদন ও বণ্টন সমস্ত সমাজের কাজ। সম্প্রতি কেবল সম্পত্তিবান ব্যক্তিদের মর্জি ও স্বার্থের উপরে তাহার নির্ভর থাকাতে জনসাধারণ স্ব স্ব অবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতি সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। .....ধনহীন স্বাধীনতা অসম্ভব, কথাটা সত্য। সেই জন্যই ধন সাধারণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক — কারণ, তাহা ব্যতীত স্বাধীনতা সর্বসাধারণের মধ্যে কিছুতেই ব্যাপ্ত হইতে পারে না। .....সোস্যালিজম সকলের মধ্যে ধনের সম বিভাগ করিয়া দিয়া পুনশ্চ সকলকে একতন্ত্রের মধ্যে বাঁধিতে চাহে এবং এই উপায়ে সকলকে যথাসম্ভব স্বাধীনতার অধিকারী করিতে চাহে, মানব সমাজে ঐক্য এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য ইহার উদ্দেশ্য।"[৩১]

দ্বিতীয়বার ইউরোপ থেকে প্রত্যাগমনের পরেই দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে, রবীন্দ্রনাথ কে জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে কলিকাতা থেকে দূরে পদ্মার কখনও শিলাইদহে, কখনও সাজাদপুর বা কালীগ্রামে বাস করতে হয়। এই প্রথম সম্পত্তি পরিদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি স্বদেশের গ্রাম ও কৃষিকেন্দ্রিক মানবজীবন যাত্রার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। এবং নিজের প্রজাদের সঙ্গে তাঁর একটি মানসিক সম্পর্ক ও স্থাপিত হোল। নিজের নতুন দায়িত্ব বিষয়ে 'ছিন্ন পত্র'-এর বিভিন্ন পত্রে তিনি রসিকতা ও করেছেন। এই দরিদ্র প্রজারা রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল, কারণ এরাই দেশের প্রকৃত জন সাধারণ, সমাজের

পতিসর হতে , "আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে ভারী মায়া করে – এরা
যেন বিধাতার শিশু সন্তানের মতো – নিরুপায় – তিনি এদের মুখে নিজের
হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে
যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে, কোনো মতে একটুখানি খিদে ভাঙলেই
আবার তখনি সমস্ত ভুলে যায়। সোশিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ
করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানিনে – যদি একেবারে অসম্ভব হয় –
তাহলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর ,মানুষ ভারী হতভাগ্য। কেননা, পৃথিবীতে
যদি দুঃখ থাকে তো থাক, কিন্তু তার মধ্যে একটুও একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা
রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম
চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে। যারা বলে, কোনো
কালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবন ধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যকীয় জিনিসও
বণ্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনামাত্র, কখনোই সকল মানুষ খেতে
পরতে পাবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর
কোন পথ নেই – তারা ভারী কঠিন কথা বলে।" ৩২

১৩১১ বঙ্গাব্দের ৭ই শ্রাবণ ,মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি
পাঠ করলেন। রবীন্দ্রনাথের সমাজতত্ত্ব, এই প্রবন্ধে একটি সংহত, ও পূর্ণ আকারে প্রকাশিত
হোল,। তিনি এদেশীয় সমাজকে, রাষ্ট্র নির্ভরতা থেকে সরিয়ে এনে,একটি জাতীয় শক্তি
হিসেবে, বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চাইলেন।'স্বদেশী সমাজ' –এই
রবীন্দ্রনাথের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ, পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে
এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও সমাজ চিন্তার পূর্ণ প্রকাশ। বাংলা দেশের জলকষ্ট
নিবারণ সম্বন্ধে সরকারের মন্তব্যই এ প্রবন্ধের উৎস। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ , এদেশীয়
সমাজের রাষ্ট্র নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনের ঐতিহ্য স্মরণ করলেন ,

"আমাদের দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ রাজ্য রক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন,কিন্তু
বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে,
এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া
বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবুও আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর
মতো করিতে পারে নাই , সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া

করিয়া দেয় নাই । .... সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে বিকৃত হয় নাই ।"[৩৩]

রবীন্দ্রনাথ, এদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের ঐতিহ্য ও ইউরোপের সরকার ও সমাজের সম্পর্কের বিচার করে উভয়ের চরিত্রগত পার্থক্য নির্দেশ করেছেন ,-

" ইংরেজিতে যাহাকে স্টেট বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার । এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি আকারে ছিল । ....বিলাত দেশের সমস্ত কল্যাণ কর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পন করিয়াছে - ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল । ...... ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত । সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয় , সেইখানেই দেশের মর্মস্থান । সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিক রূপে আহত হয় । বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয় । এই জন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার ।- আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয় । এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি । ...... ইংরেজ স্টেটকে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্ম ব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচি ।

....

.......আমাদের দেশের সরকার বাহাদুর সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে । অতএব যে কোন বিষয় তাহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া করিতে হইবে । ......"[৩৪]

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন, যে বাঙালি জাতি আজ শক্তি দ্বারা উদবোধিত হয়ে বহির্মুখী ,তার কর্মক্ষেত্র ক্রমশঃ ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ হচ্ছে । তিনি এই বহুমুখী বাঙালি জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে ,-

"ঘর ও বাহিরের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, তাহা যেন একেবারে উলটা পালটা হইয়া না যায় । বাহিরে অর্জন করিতে হইবে, ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্যই বাহিরে শক্তি খাটাইতে হইলেও অন্তরে আপনার ঘরে রাখিতে হইবে । শিক্ষা করিব বাহিরে, প্রয়োগ করিব ঘরে ।"[৩৫]

বাঙালী যখন আজ পাকিস্তানের পথে অগ্রসর হন তখন, তারা সকল কর্মে মাতৃভাষাকেই মাধ্যম করে নিতে হবে, মাতৃভাষার সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্ম সম্পাদিত না হলে দেশের আপামর সাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে।

> "সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুর্ভেদ্য পার্থক্য তৈরী করিয়া তুলিতেছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের আলাপ আলোচনার বাহিরে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি। ....
>
> পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীর হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে"[৩৬]

সামাজিক ন্যায় অর্জনের বা রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের কর্মে বা আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ বিদেশীর দাঁতের মত এ্যাজিটেশনের পক্ষপাতী নন। তিনি আমাদের সমাজ জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সামাজিক মিলনক্ষেত্রকেই, এ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের পক্ষপাতী। আমাদের দেশের গ্রামে গ্রামে, বৎসরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষে মেলা বসে। সেই মেলাকে কেন্দ্র করে বহু দূর দূরান্তের মানুষ একত্রিত হন।

> "সেখানে দেশীয় শিল্প ও কৃষি দ্রব্যের প্রদর্শনী হইবে। সেখানে ভালো কথক, কীর্তন গায়ক, ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। সেখানে ম্যাজিক ল্যান্টার্ন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইবে এবং যাহা কিছু বলিবার আছে, যাহা কিছু সুখদুঃখের পরামর্শ আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলা ভাষায় আলোচনা করা যাইবে।"[৩৭]

এই মেলা সংগঠনের মাধ্যমে, দেশের কাজের জন্য অর্থ ও সংগ্রহ করা সম্ভব। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের ঘরের ও জাতীর ক্ষুদ্র সম্বন্ধ অতিক্রম করে প্রত্যেককে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত অনুভব করার নির্দেশিত পন্থার কথাও বলেছেন।

এই 'স্বদেশী সমাজ'-এ রবীন্দ্রনাথ আধুনিক রাষ্ট্র সভ্যতাকে ও যথার্থ স্থান দিতে চান। সমাজের প্রত্যেকের সঙ্গে সমস্ত দেশের একটা প্রাত্যহিক সম্বন্ধ বেঁধে দিতে হবে। প্রতিদিন প্রত্যেকে যদি একমুঠো চাল বা এক আধ পয়সাও স্বদেশহিতার্থে দান

করেন, তাহলে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হবে না। আর এই সমগ্র বিভূতিকে পরিচালনার জন্য, রবীন্দ্রনাথ একজন সমাজপতির কথা বলেছেন।

> " একজন আমাদের সমাজপতি চাই। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পার্ষদগণ থাকিবে, কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সমাজের অধিপতি হইবেন।"[৩৮]

এই সমাজপতির অধীনে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক, দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে নিযুক্ত হবেন। সমাজের সমস্ত অভাব মোচন, মঙ্গলকর্ম চালনা, ও ব্যবস্থারক্ষা এঁরা করবেন এবং সমাজপতির কাছে দায়ী থাকবেন। সমাজানুগত প্রত্যেকের প্রাত্যহিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে যেমন তেমনই বিবাহাদি সামাজিক উৎসবে সমাজের প্রাপ্য অংশ থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ, স্বদেশির শাসন নিয়ন্ত্রণ নিরপেক্ষ একটি সুস্থ স্বদেশী সমাজ-স্থাপনার দ্বারা, দেশের প্রতিটি প্রান্তে, একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বদেশী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। রাজনৈতিক অধিকার যখন বিদেশী শাসকের নিকট থেকে ভিক্ষা করে চেয়ে নিতে হয়, ও প্রত্যাখ্যাত হতে হয়, তখন সেই প্রত্যাখ্যানের লজ্জাকে বরণ না করে, স্বদেশীয় সমাজকে এমন ভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে, সামাজিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়। সামাজিক কর্তব্য বিষয়ে সচেতন ব্যক্তি মানুষ, প্রত্যেকেই এমন একটি বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে যে, প্রাদেশিক সম্মেলন বা কংগ্রেসের আবেদন নিবেদন আন্দোলনের প্রয়োজন অনুভূত হবে না, এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেশের নেতাদের সমুখে একটি অন্যতম সুসংবদ্ধ ও নিখুঁত সমাজ-পরিকল্পনাও পেশ করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রারম্ভকালে দেশের ক্ষুব্ধ আবেগের বহিঃপ্রকাশকে রবীন্দ্রনাথ গঠনমূলক খাতে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সংহত করতে না পারলে, দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন কোন স্থায়ী ফল লাভে বঞ্চিত হবে। কিন্তু বিদেশী জিনিস বয়কট আন্দোলনের দ্বারা উদ্বেলিত বাঙলাদেশের জন মানসকে, তৎকালীন নেতারা কোনো সঠিক পথে চালিত করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে প্রথমাবধিই একাত্ম ছিলেন, সেহেতু ও বয়কট আন্দোলনকে তিনি মন থেকে সমর্থন করতে পারেন নি। তথাপি আন্দোলনের ব্যাপকতা তাঁকে দূরে থাকতে দেয়নি। জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রয়োজন দেখা দিল, 'বেঙ্গল কাউন্সিল অব এডুকেশন' স্থাপিত হল। রাজনৈতিক নেতাদের শিক্ষা পরিচালনা তাঁর মনঃপুত হোল না। স্বদেশী আন্দোলনও সংগঠনমুখী হয়ে উঠতে পারল না। রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলন থেকে দূরে সরে গেলেন।

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের আদর্শে, রবীন্দ্রনাথ একটি সমাজ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হোল।[৩৯]

রবীন্দ্রনাথের কাছে ক্রমশঃই ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী রূপটা প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। লর্ড কার্জনের ভারতবর্ষকে বৃটিশ এম্পায়ারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহ্বানকে উল্লেখ করে তিনি 'ইম্পীরিয়ালিজম' প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদের রূপটা উদঘাটন করলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও প্রকাশিত হোল,

> "ভারতবর্ষের মতো এত বড়ো দেশকে এক করিয়া তোলার মধ্যে একটা গৌরব আছে। ইহাকে চেষ্টা করিয়া বিচ্ছিন্ন রাখা ইংরেজের মতো অভিমানী জাতির পক্ষে লজ্জার কথা।
>
> কিন্তু ইম্পীরিয়ালিজম — মন্ত্রে এই লজ্জা দূর হয়। ব্রিটিশ এম্পায়ারের মধ্যে এক হইয়া যাওয়াই ভারতবর্ষের পক্ষে যখন পরমার্থ তখন সেই মহদুদ্দেশ্যে ইহাকে জাঁতায় পিষিয়া বিশ্লিষ্ট করাই ফিলানথ্রপি।"[৪০]

'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত এই রচনাগুলির প্রায় সমকালে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের, কংগ্রেসের, পন্থা ও অন্য বিষয়ক মতান্তরের কালেই, ১৩১৪ থেকে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের মধ্যে 'গোরা' লিখিত হয়। এই কালপর্বের বিচিত্র গতি সমাজ ও রাষ্ট্র আন্দোলন, ধর্মীয় ও হিন্দু পুনরুজ্জীবনের সমগ্র বিষয়টিই যেন 'গোরা' উপন্যাসে বিধৃত, এবং বিষয় রবীন্দ্র-বক্তব্য-ও।।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে, এদেশীয় মননচর্চায় যে — আধুনিকতা সঞ্চারিত হয়েছিল, প্রায় একান্ত বঙ্গদেশের, অভিজ্ঞতায়, পতনে — উত্থানে, সেই আধুনিকতাই, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে একটি দ্বন্দ্ব ও উদ্বেগের মধ্যে গ্রথিত হয়ে যায়। এই কালপর্বের, এদেশীয় ঐতিহ্যের ধারক রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক রচনাদি কোনো বিশেষ তত্ত্বের বিবর্তনের অনুসারী নয়, তাঁর অধিকাংশ এ জাতীয় রচনাই, কোনো ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। 'স্বদেশী সমাজ' — এর মতো রচনায় তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তা ভারতবর্ষীয় প্রেক্ষায় একটি পূর্ণ চেহারা পেয়ে যায়। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলনের সেই আবেগ তাড়িত বক্তৃতাগুলিতে, রবীন্দ্রনাথ আন্দোলনের কন্ঠ বাণী দিয়েছেন। আবার সংগঠন বিমুখতা তাঁকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়েও দিয়েছে। প্রায় এক শতাব্দ ব্যাপী সমাজ বিবর্তনের অমোঘতায় আবির্ভূত রবীন্দ্রনাথ, যেন — বা, স্বদেশের মৌলিক বিবেক।

তাঁর সমাজ চিন্তায়, রাজনৈতিক রচনায়, সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রথাসিদ্ধ উন্মেষ ও বিকাশের মূল সন্ধান সূত্র। তখন তো, এদেশীয় সমাজ আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে চলেছে। বাঙলা গদ্য ও সেই স্বপ্নের সন্ধানে রূপান্তরে উন্নীত। পাশ্চাত্যের সঙ্গে যাতায়াতের আঘাতে, – শিক্ষা বিনিময়ে, সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও কর্ণধারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনায় ফলে, এদেশেও ইংরেজ শাসন বিষয়ে মূল্যায়নের যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, স্বদেশী আন্দোলনে সেই নতুন বোধ ও চেতনাই, রবীন্দ্রচিন্তায় একটি নির্দিষ্ট অবয়ব পেয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় সমাজের, হিন্দুধর্মের শিল্পবোধ দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে, সেই বোধকেই সমকালের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদন স্থাপনা করেছিলেন। আর মানুষের সমগ্রতা সম্বন্ধী হিন্দু ঐতিহ্যগত শিল্পবোধ ও মানবতাবোধ, চর্চার মূল্য, যেন সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত মূল্য আবিষ্কৃত হয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথ, বিগত একশত বছরের পতন উত্থান চর্চিত এদেশীয় সমাজ ও স্বদেশ দর্শন দ্বারা ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করতে চান, তিনি ধনতন্ত্রের ক্রীতদাসের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অব্যবহিত ধনতান্ত্রিক জীবন দর্শন ও মূল্যবোধের যথার্থ বিপুল দ্বিধা, আন্তর্জাতিক শক্তি কেন্দ্রের স্থান পরিবর্তন, সভ্যতার অগ্রগমন—এই যেন স্রোতহীন নদীর মতো নিরুদ্ধ গতি হয়ে গেল, তখনি, সেই মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে সভ্যতার নতুন উত্থানমুখ খুলে যায়, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বাস্তব প্রয়োগ সার্বিকতায়, পূর্ব ইউরোপে। সেই নির্মল জলধারার প্রাণপ্রাচুর্যে মানব সভ্যতা নব নব প্রাঙ্গণে সাগর সঙ্গমী। মানব সভ্যতা এক বৃত্ত থেকে অন্যতর, সার্বিকতর বৃত্তে উন্নীত হতে থাকে, সেই সমাজ প্রতিবেদন, যার কল্পনা শুরু হয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর মনীষীদের স্বকীয় নয়নে।

বাঙলাগদ্যভাষা ও প্রথম মহাযুদ্ধপূর্ব পর্যায়ে সভ্যতার নতুন পথ সন্ধান করেছে রবীন্দ্রনাথে, শিল্পবোধ ও আন্তর্জাতিকতা বোধ দ্বারা শাসিত হয়ে, সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র আবিষ্কারে, সম্পদের সীমাহীন ঔদ্ধত্যের পরিচয় লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় নয়নে, সেই কঙ্কালের ছায়াপাত ঘটে যায় অনিবার্য, রবীন্দ্রনাথ মানুষের সেই অখণ্ডতাকে ফিরিয়ে আনতে চান, ধনতন্ত্রে যার খণ্ডনই – সভ্যতার ভবিতব্য। রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতীয় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠতম চিন্তা ও দর্শনকে, বিশ্বের সমক্ষে তুলে ধরেন, প্রথম মহাযুদ্ধে ক্রুদ্ধ গতি, শিল্পবোধ ও মহামিলনের মধ্যে অভিভূত পাশ্চাত্য সভ্যতা, রবীন্দ্রনাথকে, সেই সঙ্গেই তাঁর দর্শনকেও, – যার ভিত্তিমূল ভারত বর্ষের সহস্র বছরের সাধনায়, যা

মানব -মিলনের মন্ত্র, " একথা বলে গেছেন । ধনতান্ত্রিক সভ্যতা যখন সাম্রাজ্যবাদের পশুশক্তির প্রবল তাড়নায়, সভ্যতার প্রাণমূলে আঘাতে উদ্যত, তখনই প্রাচ্যের মানবমুখী ও নির্ভয় চিন্তন বাণীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিবেক আসুরিকতার স্বীকৃতি দেয় । রবীন্দ্র-নাথে, বাঙলা গদ্যভাষা সমূহের স্থান লাভ করে যায় ।

....

<u>প্রসঙ্গ সূত্র</u> ঃ নবম পরিচ্ছেদ । রবীন্দ্রনাথ

১. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্র জীবনী । কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৭ । সংশোধিত প্রথম খণ্ড । পৃঃ ৪৫

২. অজিত কুমার চক্রবর্তী ঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । কলিকাতা, জিজ্ঞাসা ১৯৭১, পৃঃ ১৬ ও কিশোরীচাঁদ মিত্র ঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর, ইংরাজী থেকে বাঙলায় অনুবাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পাদক কল্যাণ কুমার দাসগুপ্ত । কলিকাতা সম্প্রতি ১৯৬২ ,পৃঃ ৭

৩. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঃ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, কলিকাতা দে'জ পাবলিশিং হাউস,১৩৭৯ ।পৃঃ ৩৮৬ — ৩৯১

৪. প্রভাত মুখোপাধ্যায় ঃ — রবীন্দ্রজীবনী, ১মখণ্ড পৃঃ ১৮৪

৫. তদেব ঃ পৃঃ ২৩৫

৬. তদেব ঃ পৃঃ ২০৫

৭. রবীন্দ্র রচনাবলী ঃ —বিশ্বভারতী, ১৭ শ খণ্ড, গ্রন্থ -পরিচয় (জীবনস্মৃতি) পৃঃ ৪৭০-৭৪
জীবনস্মৃতি ,১৩৭৫,গ্রন্থ পরিচয় পৃঃ ১৮৮

৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা '
২য় খণ্ড । পৃঃ ৩৫৭

৯. অজিত কুমার চক্রবর্তী ঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । পৃঃ ৭

১০. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আত্মজীবনী, সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী,৪র্থ সং কলিকাতা বিশ্বভারতী,১৯৬২

১১. নেপাল মজুমদার : ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ : [১মখণ্ড]
কলিকাতা বিদ্যোদয়, ১৯৬১ । পৃঃ ২৫

১২. দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র রচনাবলী । বিশ্বভারতী । প্রচলিত সংস্করণ । ১মখণ্ড পৃঃ ৩৪৯

১৩. প্রভাত মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী ,১মখণ্ড পৃঃ ১২২

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চেঁচিয়ে বলা , ভারতী ১২৮৯ । প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী ১মখণ্ড উদ্ধৃত । পৃঃ ১৬৯

১৫. রবীন্দ্রনাথ : জিহ্বা আস্ফালন । ভারতী ১২৯০ 'প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী ১মখণ্ডে উদ্ধৃত ,পৃঃ ১৬৯

১৬. রবীন্দ্রনাথ : ন্যাশনাল ফণ্ড । ভারতী ১২৯০ । পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংস্করণ, দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ৭৮৩

১৭. ঐ : ন্যাশনাল ফণ্ড । প্রভাত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র জীবনী ১মখণ্ডে উদ্ধৃত পৃঃ ১৭০ – ১৭১

১৮. রবীন্দ্রনাথ হাতে কলমে । ভারতী ১২৯১ । প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত ,পৃঃ ১৭২

১৯. রবীন্দ্রনাথ : [illegible], রবীন্দ্র রচনাবলী । প্রচলিত সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৪

২০. তদেব পৃঃ ১৭১

২১. তদেব পৃঃ ১৭৫

২২. তদেব পৃঃ ১৬৪

২৩. তদেব, পৃঃ ১৭৪

২৪. রবীন্দ্রনাথ : য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি । খসড়া । কলিকাতা, বিশ্বভারতী ১৩৬৭ । পৃঃ ১৭৫ – ৭৬

২৫. তদেব : পৃঃ ২৩৫ – ২৩৬

২৬. নেপাল মজুমদার ঃ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ
কলিকাতা বিদ্যোদয়, ১৯৬১, পৃঃ ৬০

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঃ য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি । পৃঃ ১৯১

২৮. তদেব, পৃঃ ২৩৯ – ৪০

২৯. তদেব পৃঃ

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঃ ক্যাথলিক সোশ্যালিজম । সাধনা মাঘ ১২৯৮

৩১. রবীন্দ্রনাথ ঃ সোশ্যালিজম 'সাধনা ,চৈত্র ১২৯৯

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঃ ছিন্নপত্রাবলী । কলিকাতা বিশ্বভারতী, ১৩৬৭ ।পৃঃ ২৪৪ – ২৪৫

৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঃ স্বদেশী সমাজ । রবীন্দ্র রচনাবলী । বিশ্বভারতী,তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৫২৭

৩৪. তদেব পৃঃ ৫২৮ – ২৯

৩৫. তদেব পৃঃ ৫৩১

৩৬. তদেব পৃঃ ৫৩১ – ৩২

৩৭. তদেব পৃঃ ৫৩২

৩৮. তদেব পৃঃ ৫৪০

৩৯. প্রভাত মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট পৃঃ ৫১৭

৪০. রবীন্দ্রনাথ ঃ রাজা প্রজা । রবীন্দ্র রচনাবলী । বিশ্বভারতী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৩ ।